দিবাবসান

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

যে ক'টা জিনিস আমার ভালো লাগছিল তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে চারিধারের নির্জনতা—যে দিকে চাই, কোনো দিকে কাউকে চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গাছপালার সমাবেশে প্রকৃতির কোনো দৈন্য চোখে পড়ছিল না—বনে, ঝোপে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে, খড়ে, ঘাসে অযত্ন-সজ্জিত প্রকৃতির পরিস্ফুট বন্যসৌন্দর্য। এই আছে, তার পেছনে আরো, তার পেছনে আরো, দূরে দূরে আরো নানা রকমের বন-ঝোপের সমাবেশ, ঠাসাঠাসি, অগাধ সবুজ সমুদ্রে জমাট পাকিয়ে আছে। ইচ্ছামতো যত খুশি দেখতে পারি, ফুরিয়ে যাবে না, মানুষের হাতে বাছাই করে পোঁতা দু-দশ রকমের শখের গাছ নয়। একটা উঁচু ঢিবির ওপরে নানাজাতীয় গাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে—একটা বড় সাঁইবাবলা গাছ, তলায় আধ-শুকননা উলুখড়, কাঁটাওয়ালা বৈঁচি গাছ, আসশেওড়া, ভাঁট, কচু, ওল, বিছুটি-লতা—সবগুলো জড়িয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। ঢিবিটার ওপর উঠে নোনা গাছটার ছায়ায় একটু বসলুম। এমন শান্তি অনেকদিন অনুভব করিনি—চারিদিকে চেয়ে শান্তি—কেউ কোনো দিকে নেই আর গাছগুলোর দিকে চেয়ে মহাশান্তি এই যে, সেগুলো মানুষের হাতে পোঁতা নয় আদৌ—সম্পূর্ণ বনজ, একেবারে খাঁটি নিখুঁত বনজ। তলায় একেবারে শুয়ে পড়লুম। আঃ, কি আরাম! হলদে ফুলে ভরা বিছুটিলতা মাথার ওপরে দুলছে, বাতাস লেগে শুকনো সাঁইবাবলার পাতা ঝর-ঝর করে বুকের ওপর ঝরে পড়ছে। দুর্গা-টুনটুনি পাখি একেবারে কানের কাছে শেওড়ার ডালে বসে কুচকুচ করছে। বড় দুঃখ হল, সঙ্গে কোনো বই আনিনি। প্রাণে রস যোগায় এমন বই যদি পড়তে হয় তবে এই তার স্থান। এই রকম শান্ত শীতের অপরাহ্নে এই রকম ধু-ধু মাঠের ধারের নির্জন ঝোপের মধ্যে, ডান হাতের খুঁটি দিয়ে মাথাটাকে উঁচু করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়তে হয় শেলির কবিতা, কি ডারউইন, কি মানুষের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তার ইতিহাস, কি ঐ রকম একটা কিছু। আবদ্ধ লাইব্রেরি ঘরে পুরাতন বই ও ন্যাপথলিনের গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাসের মধ্যে বসে বই পড়লে অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্যের আবহাওয়ায় সদ্য পণ্ডিত হয়ে উঠেছি মনে করে পুলকিত হওয়া যায় বটে, কিন্তু এ-রকম নির্জন ঝোপে খোলা আকাশের তলায় বসে পড়বার ঐশ্বর্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আরাম করে পড়বার এই তো জায়গা। গাছগুলোর পাতার দিকে চেয়ে যখন মনে হবে, মাঠের মধ্যে এই সামান্য শেওড়াগাছ, এই সামান্য উলু—খড়টাও নয় কোটি মাইল দূরবর্তী সূর্যের দিকে পত্র-পুষ্প ফিরিয়ে আছে প্রাণশক্তির ইন্ধন ভিক্ষার আশায়, ঐ বিরাট অগ্নিপিণ্ডের লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ প্রজ্বলন্ত হাইড্রোজেন-শিখার রক্তলীলার আড়ালে পৃথিবীর মাঠের এই সামান্য বিছুটিলতাটিরও জীবন লুকানো রয়েছে—ডারউইনের লেখা তখন মনের মধ্যে নতুন রস যোগাবে, শেলির কবিতার নতুন অর্থ হবে। এরকম অবস্থায় আধঘণ্টার মধ্যে মনের হয়তো যে দ্বার খুলে যেতে পারে, আঁটসাঁটা বন্ধ ঘরে ইলেকট্রিক পাখার তলায় আরাম—কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লে সাত বৎসরেও সে দ্বারের সন্ধান মিলবে না।

লতা যেমন ঐ বাবলা গাছের আড়ালে হেলে পড়া সূর্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে, এখানে মন তেমনি উন্মুক্ত উদার বিপুলা প্রকৃতি থেকে নতুন রস পান করে বলী হয়।

বেলা পড়ে যাচ্ছে দেখে নোনাগাছের তলা থেকে উঠলুম। মাঠের মধ্যে তখন গাছপালার দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া পড়ে গেছে, বাবলা বনের ওপর সূর্য হেলে পড়েছে। চলতে চলতে আর একটা ঝোপের মাথা থেকে একটা বেগুনে রঙের অজানা বনফুল তুলে নিলুম। তার গর্ভকেশরের চারিপাশ ছোট ছোট লাল লাল পিঁপড়েয় ভরা, তাদের সর্বাঙ্গ ফুটন্ত ফুলের পরাগে মাখামাখি,-মধু খেতে এসে তারা গাছের কি মহৎ উপকার করে যাচ্ছে। চেয়ে দেখলুম সে রকম গাছ চারিপাশে আরো অনেক। সবগুলোতেই ফুল ফুটে আছে। আমি উদ্ভিদ—বিদ্যার ছাত্র নই, স্ত্রী-ফুল পুরুষ-ফুল চিনিনে, তা হলে ব্যাপারটা বেশি করে উপভোগ করতে পারতাম। ঝোপের মাথায় হলদে-পাখা প্রজাপতি উড়ছে। এই সব ছোট ছোট পোকামাকড় প্রজাপতি আর এই অখ্যাত অজ্ঞাত উদ্ভিদ-জগৎ পরস্পর অদ্ভুত কার্য—কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ, পরস্পরের উপর নির্ভর করছে। গাছপালা কঠিন মাটি থেকে, বায়ুমণ্ডল থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজের দেহের মধ্যে অদ্ভুত কৌশলে খাদ্য তৈরি করছে প্রাণীজগতের জীবনধারণের জন্যে—ওগুলো তো প্রাণী-জগৎকে খাদ্য যোগাবার একপ্রকার যন্ত্র। প্রাণী-জগৎ কত রকমে তাদের বংশবৃদ্ধির সাহায্য করছে, আর সকলে মিলে নির্ভর করে আছে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্তী ঐ বিরাট অগ্নিকুণ্ডটার ওপর। এই পাখি, এই প্রজাপতিটা, এই ফুল, এই তুচ্ছ কি গাছটা, এই লতা, এই আকাশ,

বাতাস, জল, মাটি, ঐ যে উজ্জ্বল হয়ে আসছে ঐ চাঁদটা, এই চারিধার, এই প্রাণী-জগৎ, ঐ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য, ঐ অনন্ত মহাব্যোম, এই বিপুল বিশাল অচিন্ত্যনীয় অসীমতা—সবগুলোর মধ্যে পরস্পর কি আশ্চর্য নাড়ির যোগ! কি বিপুল রহস্যে ভরা তাদের এই পরস্পরনির্ভরতা।

মাঠের সামনে গ্রাম পড়ল। অড়হর ক্ষেতের চারিধারে ধঞ্চে গাছের বেড়া দিয়েছে। ওধারে ভুর—ভুর করে কোথা থেকে ফুটন্ত সরষে ফুলের গন্ধ আসছে। এদিকে বেড়ার গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল ফুটে বেড়া আলো করে রেখেছে, গন্ধটায় বড় ঝাঁঝ। মাঝে মাঝে গাছে নাটাফলের থোলো শুকিয়ে আছে। একঝাড় পাথরকুচি গাছের পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে, তাদের পাতাগুলো সিঁদুরের রঙ হয়ে উঠছে। একটা ঘন আলকুশি লতার ঝোপের মধ্যে থেকে শীতের বৈকালের ঠাণ্ডা গন্ধের সঙ্গে কি একটা ফুলের তীব্র ঘন সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে...মাথার উপর দিয়ে আকাশ বেয়ে এক ঝাঁক বালিহাঁস বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

কাশির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, গ্রামের ও-দিকের পথ বেয়ে দুজন র‍্যাপার-গায়ে জুতো-পায়ে ভদ্রলোক আসছেন। এখান থেকে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত, এ রকম ঝোপের কাছে উদভ্রান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তাঁরা আমাকে পাগল ঠাওরাবেন নিশ্চয়, কারণ বিনা কাজে মাঠের মধ্যে ঝোপের দিকে হাঁ করে চেয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন—এ দৃশ্যটা আমাদের দেশে একেবারেই আজগুবি।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই বাড়ি। একজন বৃদ্ধ জনকতক লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে—এই তো পথ ছিল রে বাপু! মাছ তরকারি সব বাড়ি বসে কেনো বাজারে কি যেতে হত? বেগুন সব এমন এমন—আর সস্তাও কি! মনে আছে তখন বিষ্ণুপুরের হাট বিষ্ণুপুরেই ছিল, রাজগঞ্জে উঠে আসেনি। একবার—।'...পুরনো পোড়া বাড়িটার একটা দেওয়াল তখনো দাঁড়িয়ে আছে, স্তূপাকৃতি ইটকাঠের মধ্যে নিমগাছ আর যগডুমুর-চারা গজিয়ে উঠেছে। দেওয়ালের গায়ে দোতলার সমান উঁচুতে একটা কুলুঙ্গি। কে জানে, সতেরো বছর আগে হয়তো এই জীর্ণ পরিত্যক্ত আবাসে কোনো নববধূ তার মেথিতে ভেজানো সুগন্ধ নারকেল তেলের পাথরবাটি ঐ কুলুঙ্গিতে রেখে দিত! ঐ ঘরের মধ্যেই কত বছর আগেকারের তাদের ফুলশয্যার প্রথম প্রণয়ের মধুরাত্রি কেটে গিয়েছে!

কোথায় আজ আশি বৎসর আগেকার সে সব প্রথম প্রণয়-হর্ষাকুলা তরুণী নববধূ? কোথায় তাদের প্রিয়জনেরা? কোন দূর অতীতে কতদিন হল ছায়ার মতো মিশে গিয়েছে, কে আজ তাদের সন্ধান দিতে পারে!

একটা বাড়ির উঠানে একটা বিলাতি আমড়া-গাছতলায় একদল পাড়ার ছেলে খেলা করছে, নতুন লোক দেখে তারা খেলা ফেলে আমার দিকে সকৌতুকে চেয়ে রইল। অন্ধকার ঝুপসি বাঁশ-বাগানের মধ্যে ডোবার ধারে বসে একজন পল্লীবধূ বাসন মাজছে—তাদের তরুণ জীবনও সেই বাঁশ-বাগানের মধ্যেকার আসন্ন শীতসন্ধ্যার মতোই ঘুলি ঘুলি অন্ধকার। সামনের এক বাড়ির দোর খুলে আর একটি বধূ এ-হাতে একটি ঘড়া ও-হাতে আর একটি নিয়ে বার হয়েই হঠাৎ আমায় সামনে দেখে ঘড়াসুদ্ধ ডান হাতটা তাড়াতাড়ি খানিকটা উঠিয়ে এবং মাথাটা খানিকটা নুইয়ে হাতের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোমটা টেনে দিলেন। একটি বাড়ির মধ্যে উঁচু মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—"আমি জানিনে খুড়িমা, মাঝের ঘরেই তো ছিল, কে নিয়েছে আমি জানিনে!'—জন-চার-পাঁচ ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে—তাদের মধ্যে একজন একটা কঞ্চি হাতে উঠানের একটা কুলগাছ থেকে কাঁচা সবুজ কুল পাড়ছে। –'ঐ যে রে তোর বাঁ হাতের ডালে—আর একটু উঁচুতে—এ যে একটু একটু রাঙা হয়েছে না? হ্যাঁ হ্যাঁবলা বাহুল্য পৌষমাসের প্রথম রাঙা হওয়া দূরের কথা কুলের মধ্যে আঁটিও হয়নি। পথের বাঁক ফিরে একটা বেশ বড় বাড়ি-লোহার বড় বড় গজাল মারা প্রকাণ্ড সিংদরজা, বালির কাজ খসে পড়ছে, পাঁচিলের মাথায় বনমুলোর গাছ গজিয়েছে। বাড়ির সামনে পেরেক ঝুলোনা একটা রংকরা ডাকবাক্স, Next Clearence-এর নীচে Thursday-র প্লেট বসানো।

পাড়া পার হয়ে একটা বাঁশ বাগান পড়ল। তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা। মচমচ করে শুকনো বাঁশপাতার রাশ ও বাঁশের খোলা জুতোর নীচে ভেঙে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালার লতাঝোপের ঘন সমাবেশ, কি বিরাট প্রাচুর্য! জীবনের কি প্রবল উচ্ছ্বাস! সমস্ত ঝোপটার মাথা জুড়ে সাদা সাদা তুলোর মতো রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে। সমস্ত ঝোপটির কি সম্মিলিত সুগন্ধ, কি স্নিগ্ধ স্পর্শ! এইবার গ্রামের শেষে

কাওরাপাড়া। ছোট্ট ছোট্ট চালাঘর, একটার উঠানে শুকনো পাতালতা জ্বেলে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে আগুন পোয়াচ্ছে। বাড়ির পিছনে খেজুরগাছে ভাঁড় ঝুলনো। বাড়ির মধ্যে সীম গাছ, লাল গাছের মাচা। তিন-চারটে কুকুর জুতোর শব্দে ছুটে এসে নতুন লোক দেখে বেজায় ঘেউ-ঘেউ আওয়াজ শুরু করে দিলে। সরু পথ বেয়ে আবার গ্রামের পিছনের মাঠে এসে পড়লুম।